শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

১.০: জৈন-দর্শন (The Jaina Philosophy)

ভারতের প্রাচীনতম অসনাতন নাস্তিক্য ধর্মদর্শনের অন্যতম হচ্ছে জৈনদর্শন। 'জিন' শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। 'জিন' অর্থ বিজয়ী। যিনি ষড়রিপুকে জয় করেছেন, তিনিই জিন। জৈনদের মতে, যথার্থ সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে যাঁরা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেছেন তাঁরাই জিন। জৈন ঐতিহ্যে এজাতীয় চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের পারম্পর্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, যাঁদেরকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই পরম্পরায় চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। মহাবীর ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। তাই জৈন ঐতিহ্যের ওই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে জৈনধর্মকে অত্যন্ত প্রাচীন বলে স্বীকার করতে হবে।

জৈনদর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে জানি তাই সত্য ও যথার্থ। জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, অতএব কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুসমূহ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, জীব এবং অজীব। দেহ যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা তথা সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈনধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি।

১.১ : জৈনদর্শনের উত্থানভূমি

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম ও এর ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে উদ্ভুত যে অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতে দুর্বিসহ ব্রাহ্মণ্যবাদের রিরোধী হিসেবে বৌদ্ধধর্মের জন্ম, সমসাময়িক হিসেবে সেই একই প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ্য বিরোধী জৈনধর্মেরও উত্থান। তবে কালানুক্রমের হিসাবে জৈনদর্শন বৌদ্ধদর্শন হতেও প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী এই ধর্ম সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদভাবনার সাথে কম-বেশি সাদৃশ্য বহন করে। তবে চার্বাকদের মতো জৈনগণও বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ভূতচতুষ্টয়ের থেকে অতিরিক্ত জীবাত্মা স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে নাস্তিক হয়েও জৈনরা অনাত্মবাদী বৌদ্ধদের থেকে স্বতন্ত্র। তাই অধ্যাপক হপকিন্সের (Hopkins) মতে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যবর্তী তাত্ত্বিক সোপানরূপে জৈনদর্শনের অবস্থান।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

বেদ ও উপনিষদে বিবৃত কিছু সিদ্ধান্তের সাথে জৈনমতের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন জৈনরাও পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের মতে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা কিংবা দৈত্যের দেহ ধারণ করতে পারে। কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দর্শনে সিদ্ধপুরুষকে 'অর্হৎ' নামে অভিহিত করা হতো বলে জৈনদর্শনকে আর্হতদর্শনও বলা হয়। পরবর্তীকালে এই দর্শনের নাম হয়েছে জৈন দর্শন। 'জিন' দ্বারা প্রবর্তিত বলে এই 'জৈন' নামকরণ। জৈনমতের প্রচারকদেরকে 'তীর্থঙ্কর' বলা হয়। জৈনবিশ্বাস মতে, এই তীর্থঙ্কররা সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করে সকল তত্ত্ব জয় করেছেন বলে তাঁরা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। একারণে এই মতকে সর্বজ্ঞাতাবাদীও বলা হয়।

.

জৈনমত অনুসারে, তাঁদের ধর্ম সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হতে প্রচলিত আছে। প্রত্যেক উৎসর্পণকারী (=উত্থানকারী) ও অবসর্পণকারী (=নীচে অর্থাৎ ভূলোকে আবির্ভূত) তীর্থঙ্করের সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশ। তাঁদের মধ্যে অন্তিম অবসর্পণকারী প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভদেব, নামান্তরে যাঁকে আদিনাথ হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দির ভারতীয়রা পূজা করতো বলে জানা যায়। ভাগবতপুরাণে তাঁকে জৈনদর্শনের প্রতিষ্ঠাপক বলা হয়েছে এবং তিনি বিষ্ণুর চব্বিশটি অবতারের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত। তিনি মনুবংশীয় নাভিরাজের পুত্র এবং তাঁর মায়ের নাম হচ্ছে মরুদেবী। এছাড়া যজুর্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি এই তিনজন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জৈনদর্শনের অতীব প্রাচীনতার দাবী করা হয়। এদের মধ্যে অরিষ্টনেমি হচ্ছেন বাইশতম তীর্থঙ্কর, যাঁর অন্য নাম হচ্ছে নেমিনাথ।

.

জৈনদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলে তীর্থঙ্করগণই জৈন দর্শনে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত। জৈনগণ তাই ঈশ্বরের পরিবর্তে তীর্থঙ্করদের পূজা করেন। জৈনরা মনে করেন, এই তীর্থঙ্করেরা প্রথম জীবনে ছিলেন বদ্ধ জীব। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁরা নিজের চেষ্টায় পূর্ণ, মুক্ত ও সর্বজ্ঞ হয়েছেন। জৈন বিশ্বাস মতে, তীর্থঙ্করদের মতো যে কোন জীবই নিজের চেষ্টায় পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারে। মুক্ত, পূর্ণ ও সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করগণ জৈনধর্মে 'জিন' নামে পরিচিত। 'জিন' শব্দের অর্থ জয়ী। যাঁরা রাগ, দ্বেষ ও অন্যান্য বন্ধনের কারণকে জয় করে মোক্ষলাভ করেছেন, তাঁরাই 'জিন' নামে অভিহিত।

.

জৈন ঐতিহ্যে যে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য উল্লেখ করা হয়, তাঁদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব আদিনাথ ও চব্বিশতম বা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান। এ দুয়ের মধ্যবর্তীরা হচ্ছেন- ২.অজিতনাথ, ৩.সম্ভবনাথ, ৪.অভিনন্দ, ৫.সুমতিনাথ, ৬.পদ্ম, ৭.প্রভু, ৮.সুপর্শ্বনাথ, ৯.চন্দ্রপ্রভু, ১০.সুরিধিনাথ, ১১.শিতলনাথ, ১২.শ্রেয়োনাথ, ১৩.বসুপুজ্য, ১৪.বিমলনাথ,

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

১৫.অনন্তনাথ, ১৬.ধর্মনাথ, ১৭.শান্তিনাথ, ১৮.কুন্থুনাথ, ১৯.অমরনাথ, ২০.মল্লিনাথ, ২১.মুনিসুব্রত, ২২.নেমিনাথ, ২৩.পার্শ্বনাথ। আদিনাথ ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী তীর্থঙ্করদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা দাবী করা হয়।

.

তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (৮১৭-৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব) হলেন কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম বামদেবী। জনশ্রুতি অনুযায়ী, পার্শ্বনাথ প্রচুর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে কৈবল্য লাভ করেন এবং সত্তর বছর বয়সে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পার্শ্বনাথের দুই শতকেরও অধিককাল পর চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের আবির্ভাব। মহাবীর বর্ধমানকেই জৈনমতের প্রধান প্রবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। তীর্থঙ্কর বর্ধমানকে জৈনরা বলেন মহাবীর এবং বৌদ্ধরা বলেন নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র)। গ্রন্থিহীন বা নির্গ্রন্থ বা নগ্ন অবস্থায় থাকতেন বলে মহাবীর বর্ধমানকে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে পালি পরিভাষায় নিগণ্ঠ বলা হতো।

২.১ : জৈনমতে 'নয়'

...

জৈনরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞানের বিভাগ করেছেন, যা 'জৈন প্রমাণশাস্ত্রে জ্ঞান ও তার ভেদ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্য আরেক দিক থেকে জৈনমতে জ্ঞানকে 'প্রমাণ' ও 'নয়' ভেদে দুইপ্রকার বলা হয়েছে।

জৈনমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রমাণের দ্বারা আমরা অনেক বিশিষ্ট বস্তুকে জানতে পারি। তবে প্রমাণ হলো কোন একটি বস্তুর নিছক জ্ঞান, কিন্তু 'নয়' হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর জ্ঞান। অর্থাৎ নয়-এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চিন্তার বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়ে থাকে-

'যস্যাং নীতৌ স্যাদ্বাদস্যানুকূলতয়া বস্তুনির্ণয়ো ভবতি স নয় ইত্যুচ্যতে'। অর্থাৎ : যে নীতিতে স্যাদ্বাদের অনুকূলরূপে বস্তুনির্ণয় হয় তাকে 'নয়' বলে। (সূত্রঃ ড. বিশ্বরূপ সাহা/ নাস্তিকদর্শনপরিচয়ঃ)

'নয়' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো মত বা সিদ্ধান্ত, কিন্তু জৈনদর্শনে 'নয়' শব্দটি পারিভাষিক অথচ অন্বর্থক। 'নয়' শব্দের অর্থ কোন বস্তুর সাপেক্ষ নিরূপণ। জৈনাচার্য দেবসূরি নয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

'যেন শ্রুতাখ্যপ্রমাণবিষয়ীকৃত স্যার্থস্যাংশতস্তদিতরাংশ ঔদাসীন্যতঃ স প্রতিপত্তুরভিপ্রায়বিশেষো নয় ইতি।'

অর্থাৎ : যার দ্বারা শ্রুত নামক প্রমাণের বিষয়ীকৃত অর্থের অংশবিশেষের জ্ঞান হয় এবং অন্য অংশের ঔদাসীন্যবশত হয় না, জ্ঞাতার সেই অভিপ্রায় বিশেষকে 'নয়' বলে।

জৈনদার্শনিক প্রভাচন্দ্রও তাঁর 'প্রমেয়কমলমার্ত্তন্ডে'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অনুরূপভাবে বলেছেন যে–

'অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষো বস্ত্বংশগ্রাহী জ্ঞাতুরভিপ্রায়ো নয়ঃ।'

অর্থাৎ : অনিরাকৃত প্রতিপক্ষ বস্তু–অংশের গ্রাহী ও জ্ঞাতার অভিপ্রায় হচ্ছে 'নয়'।

সারকথা হলো, আমাদের চিন্তা যখন কোন বস্তুকে বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে গ্রহণ করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বস্তু সম্পর্কে বিবৃতি দেয়, তখন তাকে আমরা বলি 'নয়'। 'নয়'-এর ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আপেক্ষিতা পরিস্ফুট। জৈনমতে কোন একটি বস্তু অসংখ্য বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। এই অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকেই জানতে পারি, বস্তুর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হলো আংশিক জ্ঞান। এইরূপ আংশিক জ্ঞানকে বলা হয় 'নয়'। আবার এই আংশিক জ্ঞানকে যে অবধারণ প্রকাশ করে, তাকেও 'নয়' বলা হয়। জৈনমতে নয় সাতপ্রকার, যথা– নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ, সম্বিরুদ্ধ বা সমভিরূঢ় এবং এবম্ভূত।এই সাতটি নয়ের মধ্যে নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার ও ঋজুসূত্র এই প্রথম চারটি নয় হচ্ছে অর্থপ্রধান এবং অবশিষ্ট তিনটি অর্থাৎ শব্দ, সমভিরূঢ় ও এবম্ভূত নয় হচ্ছে শব্দপ্রধান। জৈনমতে প্রত্যেকটি নয় হচ্ছে একেকটি দৃষ্টিকোণ। এই সকল দৃষ্টিকোণ হচ্ছে আংশিক। তাদের কোনটিকে সত্য বললে নয়াভাস বা ভ্রান্তি হয়। উক্ত প্রকার নয়ের দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান হচ্ছে নয়নিশ্চয়। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে নয়নিশ্চয় বলে। এই নয়নিশ্চয় দুইপ্রকার– শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। উপাধিশূন্য বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে শুদ্ধ নয়নিশ্চয় এবং সোপাধি বা উপাধিযুক্ত বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে অশুদ্ধ নয়নিশ্চয়। উপরিউক্ত সাতটি নয়ের নিম্নাভিক্রম, অর্থাৎ পূর্ববর্তী নয় থেকে পরবর্তী নয়টি সঙ্কুচিত। সুতরাং নৈগম নয় সর্বব্যাপক এবং এবম্ভূত নয় সর্বব্যাপ্য (=সবচেয়ে সঙ্কুচিত)। জৈনমতে বিভিন্ন প্রকারের নয়গুলির সংশ্লেষে পূর্ণ যথার্থ জ্ঞান হয়। এই যথার্থ জ্ঞানকে নয়নিশ্চয় বলা হয়েছে। জৈনদর্শনের নয়সিদ্ধান্তে অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। এই নয় জৈনের প্রমাণজ্ঞানে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। জৈনের স্যাদ্বাদ এই সিদ্ধান্তে আশ্রিত হয়েছে। এই স্যাদ্বাদ সপ্তভঙ্গি নয় নামে

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

খ্যাত।

জৈনদের এই 'নয়'-সম্পর্কিত মতবাদে তাঁদের যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক চিন্তাধারা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁদের যৌক্তিক মতবাদ 'স্যাদ্বাদ' এবং তাত্ত্বিক মতবাদ 'অনেকান্তবাদ' নামে পরিচিত। দুটি মতবাদই পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরমতসহিষ্ণুতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

.

(ক) : অনেকান্তবাদ

.

জৈনদর্শনে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে অনেকান্তবাদ (manyness of reality)। অনেকান্তবাদ জৈন দর্শনের একটি তাত্ত্বিক মতবাদ বলে সাধারণভাবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে অনেকান্তবাদ জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। জৈন দর্শনের কি যৌক্তিক, কি তাত্ত্বিক সমস্ত প্রকার চিন্তাধারায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এই মতে অন্যান্য সকল দর্শন একান্তবাদী, কিন্তু জৈন দর্শন অনেকান্তবাদী। 'একান্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চিত বা নির্ণীতরূপে এক প্রকার। আর তাদের মতে 'অনেকান্ত' অর্থ হলো বস্তুর অনেক প্রকার। অর্থাৎ কোন বস্তু একই রূপ বা একই প্রকার নয়। কোন বস্তুকে একান্ত বা নিশ্চিতভাবে অস্তি বা নাস্তি ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা যায় না। দৃষ্টিভেদে একই বস্তু ভিন্ন আকারে প্রতীত হয়। জৈনদর্শন বস্তুর সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করে না। জৈনরা বলেন–

'সদেব দ্রব্যস্য লক্ষণম্, অসৎ অভাবো বা তত্র ন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্বম্ ইতি।' অর্থাৎ : 'সৎ'ই দ্রব্যের লক্ষণ, 'অসৎ' বা 'অভাব' কোন স্বতন্ত্র তত্ব নয়।

জৈনমতে সৎ বস্তুর স্বরূপ অতি জটিল। সৎ বস্তু সম্যকরূপে বুঝতে হলে তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরীক্ষা করা আবশ্যক। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে চরম সত্তার অন্যান্য দিক পরিত্যাগ করে একটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোযোগ দেয়া সম্ভব। কিন্তু কোন্ অবস্থায় এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে তা বিবেচনায় না রেখে ঐরূপ বিচারকে দার্শনিক মর্যাদা দেয়া হলে সেটি দার্শনিক ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। এতে করে ঐ সৎ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মায় তা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। এই জাতীয় আংশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একান্তবাদ বলা হয়, যা একভাবে থাকে।

.

এক্ষেত্রে যদি বলা হয় 'ঘটোহস্তি' (ঘটটি আছে) একান্তভাবে সত্য, তবে ঘটাদি উৎপত্তির জন্য কুম্ভকার প্রভৃতির প্রয়োজন হতো না। আবার যদি ঘট একান্তভাবে নাস্তি বা অসত্য হতো তবে কোনভাবেই ঘটের উৎপত্তি হতে পারে না, যেমন অলীক শশশৃঙ্গের কখনো উৎপত্তি হয় না। যে বস্তু কোন দৃষ্টিতে সৎ সেই বস্তুকে দৃষ্টিভেদে অসৎও বলা যায়। অর্থাৎ

স্বরূপের (=নিজ রূপের) সাপেক্ষে যে বস্তুকে সৎ বলা হয়, সেই বস্তুকে অন্য রূপের সাপেক্ষে অসৎও বলা যায়। তাই বলা যায়, প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন এবং এই স্বভাব সেই বস্তুতেই থাকে, অন্য বস্তুতে থাকে না। যেমন ঘট ঘটত্বের দৃষ্টিতে সৎ, কিন্তু পটত্বের দৃষ্টিতে অসৎ।

জৈনমতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কতকগুলি অংশ স্থায়ী এবং কতকগুলি অস্থায়ী। আবার প্রত্যেক কার্যের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম নতুন সংক্রামিত হয় এবং কতকগুলি ধর্ম ধ্বংস হয়। প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলি গুণ থাকে ধ্রুব বা স্থায়ী, কতকগুলি গুণ হয় উৎপন্ন এবং কতকগুলি ধ্বংস হয়। সুতরাং সকল বস্তুই দ্রব্য, উৎপাদ এবং ব্যয়যুক্ত। এর থেকেই জৈনদের অনেকান্তবাদের সৃষ্টি। এই মতে চরম সৎ উৎপত্তি, ধ্বংস ও স্থায়িত্ববিশিষ্ট। প্রাণিজগতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন একটি চারাগাছের প্রথম পত্তন শুরু হয় বীজের মধ্যে। বীজটি যদি কেবলমাত্র বীজ হিসেবে স্থায়ী থাকতো এবং এর কোন প্রকার ধ্বংস না হতো, তাহলে চারাগাছটি তার বর্ধিষ্ণু জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলতো এবং শীঘ্রই মরে যেতো। কিন্তু গাছটির বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিটি স্তরে থাকে অন্তর্নিহিত অভিন্নতা। আবার একটি নিমের বীজের চারা বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যাবস্থায় আমের চারায় পরিবর্তিত হতে পারে না। অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু প্রাণীর পক্ষে অন্তর্নিহিত অভিন্নতা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। এই অভিন্নতা ছাড়া বৃদ্ধি শব্দ অর্থহীন। সুতরাং চরম সৎ-এর বর্ণনায় অবশ্যই উৎপত্তি, ধ্বংস ও অন্তর্নিহিত অভিন্নতা বা স্থায়িত্বরূপ তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হবে।

জৈনমত অনুসারে প্রত্যেক বস্তুতে অনেক গুণ থাকে। মানুষ বস্তুর একই গুণের জ্ঞান এক সময়ে পেতে পারে। কিন্তু বস্তুর অনন্ত গুণের জ্ঞান মুক্ত (=কেবলী) ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। সাধারণ মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ ও আংশিক। সাধারণ মানুষ এক কালে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর কেবলমাত্র একটি গুণ দেখতে পায়। বস্তুর এই আংশিক জ্ঞানকে জৈনমতে 'নয়' বলা হয়। নয় হচ্ছে কোন বস্তুকে বুঝবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ। একে সত্যের আংশিক রূপ বলা হয়। এর দ্বারা সাপেক্ষ সত্যের উপলব্ধি হয়, নিরপেক্ষ সত্যের নয়। প্রত্যেক নয়ে বস্তুর একদেশবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়।

যখন আমরা একটা বস্তুকে কেবলমাত্র তার দিক থেকে দেখি তখন সেইরকম দেখাকে বলে সংগ্রহ নয়। অদ্বৈত বেদান্তীরা এই দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তাঁরা বলেন, সকল বস্তুই সৎরূপে এক। আবার যখন আমরা কোন বস্তুকে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখি, অর্থাৎ তার সমস্ত গুণের সঙ্গে তাকে একত্র করে দেখি অথবা গুণগুলিকে বস্তুরই একটা স্বরূপ

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

বলে মনে করি, তখন তাকে বলে ব্যবহার নয়। আবার যখন কোন বস্তুকে বর্তমান বা ভবিষ্যতের হিসাব না করে কেবলমাত্র কোন মুহূর্তের গুণসমষ্টিরূপে দেখি এবং মনে করি যে প্রতি মুহূর্তেই কতকগুলি নতুন গুণ একত্র সমাবিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন সেই দৃষ্টিকে বলা যায় পর্যাপ্ত নয় বা ঋজুসূত্র নয়। বৌদ্ধরা এই দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এভাবে বেদান্ত, সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকরা এক একটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই চরম দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন। সেজন্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত বলে জৈনরা মনে করেন। এরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে নয়াভাস বলে। বস্তুত প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই বস্তুর এক একটি যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়। এদের কোনটিকে একান্তভাবে সত্য মেনে অপরগুলিকে উপেক্ষা করলে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্ত হয়।

সাংখ্য সৎবাদী, বৌদ্ধ অসৎবাদী, নৈয়ায়িক সদসৎ-বাদী ও মায়াবেদান্তী অনির্বচনীয়ত্ববাদী এভাবে সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অনির্বচনীয়বাদ ভেদে একান্তবাদী চার প্রকার। এই চারটির সঙ্গে অনির্বচনীয়ত্বের আরো তিনটি বাদ যুক্ত করে মোট সাতটি মতাবলম্বী পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতি 'বস্তু কি আছে?' এরূপ প্রশ্ন করলে 'কোনভাবে আছে' এই উত্তর দেওয়া যায়। এভাবে সকল একান্তবাদী ক্ষান্ত হয়ে মৌন থেকে সম্পূর্ণ অর্থনিশ্চয়কারীর স্যাদ্বাদকেই যথার্থ মনে হয়। তাই 'স্যাদ্বাদমঞ্জরী'তে বলা হয়েছে-

'অনেকান্তাত্মকং বস্তু গোচরঃ সর্বসংবিদাম্ ।

একদেশবিশিষ্টোঽর্থো নয়স্য বিষয়ো মতঃ।।'- (স্যাদ্বাদমঞ্জরী)

অর্থাৎ : ঘটাদি বস্তু অস্তি (আছে), নাস্তি (নাই) ইত্যাদি সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় বলে তা অনৈকান্তিক বা অনিশ্চয়াত্মক; প্রত্যেকটি নয়ে বস্তুর একদেশবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়।

জৈনব্যতিরিক্ত সকল দার্শনিকই হচ্ছেন একান্তবাদী। জৈনগণ মনে করেন যে, কোন বস্তু বিষয়ে তাঁদের যে নির্ণয় তা সকল দৃষ্টিতে সত্য নয়। তার সত্যতা বিশেষ পরিস্থিতিতে ও বিশেষ দৃষ্টিতেই মানা যেতে পারে। তাঁরা নিজ বিচারকে নিতান্ত সত্য বলে মানেন এবং অন্যের বিচারকে উপেক্ষা করেন বলে মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিকে বোঝাতেই জৈনরা হাতি ও ছয় অন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

জৈনরা বলেন, চরম সৎ-এর বিভিন্ন রূপকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র বিশেষ রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হলে দৃষ্টান্তস্বরূপ তা ছয় অন্ধ ব্যক্তির হাতি দেখার মতোই হবে।

একজন অন্ধ হাতির কর্ণ স্পর্শ করে জন্তুটিকে কুলোর মতো বলে, আরেকজন পা স্পর্শ করে তাকে স্তম্ভের মতো বলে, তৃতীয় জন তার শূড় স্পর্শ করে সাপের মতে বলে, চতুর্থজন লেজ স্পর্শ করে তাকে দড়ির মতো বলে, পঞ্চমজন পেট স্পর্শ করে তাকে দেয়ালের মতো বলে এবং ষষ্ঠজন মাথা ছুঁয়ে তাকে ছাতার মতো বলে। প্রত্যেকে তার জ্ঞানকে সঠিক মনে করলেও সার্বিকভাবে কোন একজন অন্ধের জ্ঞান সত্য নয়, তা অংশত সত্য হতে পারে। অনুরূপভাবে দার্শনিকদের বিচার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সত্য হলেও পূর্ণত সত্য নয়, তা হচ্ছে আংশিক সত্য। সুতরাং চরম সৎ-এর জটিল স্বরূপ স্বীকার করতে হবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে পরিপূর্ণ সৎ-এর স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করতে হবে। এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই অনেকান্তবাদ নামে পরিচিত।

.

অনেকান্তবাদ অনুসারে প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই 'হতে পারে' অর্থাৎ 'স্যাৎ' শব্দটি যোগ করে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, এই প্রকার নিশ্চয় যেমন সত্য হতে পারে তেমনি অপর রকমের নিশ্চয়ও সত্য হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি নিশ্চয় আপেক্ষিক। কোন বস্তু সম্পর্কে এরূপ কোন নিশ্চয় করা যায় না যে এটি অন্যরূপ নয়। এভাবে দেখার নাম নয়বাদ। এ থেকেই জৈনদের প্রসিদ্ধ স্যাৎবাদের উৎপত্তি। 'স্যাৎ' শব্দটি এসেছে 'অস্' ধাতু থেকে। অস্ ধাতুর অর্থ হওয়া। সুতরাং 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ 'হতে পারে'। এভাবেই জৈনদের অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্বাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই বলা হয়-

'স্যাদ্বাদঃ সর্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ।

সপ্তভঙ্গীনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিষেষকৃৎ।।'

অর্থাৎ : স্যাদ্বাদ কথঞ্চিৎ এই বিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সর্বত্র একান্ত বা নিশ্চয়কে পরিত্যাগ করে ও সপ্তভঙ্গি নয়ের অপেক্ষা রাখে। তা হেয় (=নাস্তি) ও আদেয় (=অস্তি) ভেদে বিকল্পের বিধান করে।

.

অনেক সময় স্যাদবাদকে সম্ভাব্যতার মতবাদ বলে মনে করা হয় এবং সম্ভাব্যতা যেহেতু সংশয় বোঝায়, তাই জৈন দার্শনিকদের সংশয়বাদী বলা হয়। যেহেতু জৈনদের মতে একটি 'নয়' একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি বিশেষ ধর্মসাপেক্ষ, তাই একথা সত্য যে জৈনদের স্যাদ্বাদ একপ্রকার সম্ভাব্যতার মতবাদ বা সাপেক্ষবাদ। কিন্তু এই সাপেক্ষবাদ কোনভাবেই সংশয়বাদ নয়। জৈনরা যখন কোন নয়ে বস্তুর একটি ধর্ম প্রকাশ করেন, তখন 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করেন। তার অর্থ হলো বস্তুর আরো ধর্ম আছে। কিন্তু সেই ধর্ম সম্বন্ধে কখনোই কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। জৈনদের প্রত্যেকটি নয়ই নিশ্চিত। সুতরাং স্যাদ্বাদ কখনোই সংশয়বাদ নয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

(খ) স্যাদবাদ (relativity of knowledge) বা সপ্তভঙ্গিনয় (Seven Modes of Predication)

.

নয়ের অর্থ কোন বস্তুর সাপেক্ষ নিরূপণ। যে নীতি অনুসারে স্যাদ্বাদের অনুকূলে বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ হয় তাকে 'নয়' বলে।

জৈনমতে (Jainism) একটি বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে। সাধারণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্মকে জানতে পারে। সসীম বা সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে একাধারে বস্তুর সব গুণ জানা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ পুরুষ তাঁর কেবলজ্ঞানের (absolute knowledge) দ্বারা বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্মগুলিকে জানতে পারেন। কিন্তু অপূর্ণ মানুষ একটি বিশেষ সময়ে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বস্তু দেখে থাকে। এই কারণে বস্তুর একটি বিশিষ্টধর্মই সে জানতে পারে। কোন একটি বস্তুর অনন্তধর্মের মধ্যে এরূপ একটি বিশিষ্টধর্মের জ্ঞানকে বলে 'নয়'। তাই জৈনমতে 'নয়'কে আংশিক জ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মটি জ্ঞাত হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানটি যথার্থ। কিন্তু বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞান হিসেবে এটি যথার্থ নয়। জ্ঞানের এই আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আমরা অবহিত থাকি না বলেই আমাদের মধ্যে কলহ এবং মতবিরোধ দেখা দেয়।

.

জ্ঞানের এই আপেক্ষিকতার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য জৈনগণ কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তির হাতি দেখার দৃষ্টান্তকে উপস্থাপন করেন। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে যে জ্ঞান লাভ করে তা তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করে তার মতে হাতি স্তম্ভের মতো; যে ব্যক্তি হাতির কান স্পর্শ করে তার মতে হাতি কুলার মতো; যে হাতির দেহ স্পর্শ করে তার মতে হাতি পাহাড়ের মতো; যে হাতির শুঁড় স্পর্শ করে তার মতে হাতি লতার মতো। বিভিন্ন অন্ধ ব্যক্তির এই অবধারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধমূলক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রতিটি ব্যক্তির অবধারণই পরিপূর্ণ সত্য। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাদের অবধারণগুলি আপেক্ষিক এবং আংশিক সত্যকে প্রকাশ করে। অন্ধ ব্যক্তিগণ যখন তাদের অবধারণের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে, তখন তারা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করবে এবং তাদের অবধারণগুলির মধ্যে আপাত পারস্পরিক বিরোধিতা দূও হবে। এইরূপ জ্ঞান প্রকাশক অবধারণ বা পরামর্শকেও 'নয়' বলা হয়।অন্ধ ব্যক্তিদের হাতি দেখার উপরিউক্ত দৃষ্টান্তকে ভিত্তি করে জৈনদর্শন এব চরম দার্শনিক তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে আপাত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এই বিরোধের

কারণ, আমরা বিভিন্ন মতের আপেক্ষিকতা ভুলে যাই। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত কোন বর্ণনাই পরিপূর্ণ বা এককভাবে সত্য নয়। প্রতিটি দার্শনিক মতই জগৎ ও জীবনের এক একটি বিশেষ দিককে প্রকাশ করে।

যৌক্তিক দিক থেকে জৈনগণ অবধারণের আপেক্ষিকতা বোঝাবার জন্য অবধারণের পূর্বে আপেক্ষিকতা সূচক 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করেন। জৈনদের তর্কশাস্ত্রের একটি মূল কথা হলো স্যাৎ-বাদ (relativity of knowledge)। স্যাদবাদের মূল কথা হচ্ছে- বস্তু বা সত্তার স্বরূপ বহুমুখী, তাই বিভিন্নভাবেই তা বর্ণিত হতে পারে। এর মধ্যে কোন বর্ণনাই মিথ্যা নয়, আবার কোন বর্ণনাই একমাত্র সত্য নয়। যেহেতু সত্তার বহুমুখী দিক বা স্বরূপ সম্বন্ধে সামগ্রিক উক্তি একমাত্র পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব, তাই সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের প্রতিটি উক্তিই শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনামূলক এবং এই সম্ভাবনার নির্দেশক শব্দ হলো স্যাৎ। স্যাৎ মানে কোনভাবে সম্ভব। 'স্যাৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'হয়তো' বা 'হতে পারে'। ব্যাকরণের দিক থেকে 'স্যাৎ' শব্দ সম্ভাবনানির্দেশক। কিন্তু জৈন দার্শনিকগণ 'স্যাৎ' শব্দটিকে এই অর্থে গ্রহণ করেননি। বরং জৈন দর্শনে এই শব্দটি প্রকাশিত অবধারণ ভিন্ন অন্য অবধারণের সম্ভাবনা নির্দেশক। এই 'স্যাৎ' শব্দ দ্বারা কোন একটি অবধারণের যেমন আপেক্ষিকতাকে প্রকাশ করা হয়, তেমনি আবার অন্য অবধারণের সম্ভাবনাকেও প্রকাশ করা হয়। তাই জৈন দর্শনে ব্যবহৃত 'স্যাৎ' শব্দটি কোনভাবেই প্রকাশিত অবধারণের নিছক সম্ভাবনা সূচনা করে না। প্রকাশিত অবধারণ সম্বন্ধে এখানে কোন সংশয়েরও অবকাশ নেই।

জৈনদর্শন সংশয়বাদী নয়। একটি অবধারণ আপেক্ষিক এবং এই অবধারণ ছাড়াও অন্য অবধারণ সম্ভব এক কথা, আর অবধারণটি সম্ভাব্য কিংবা সংশয়াত্মক আরেক কথা। 'হস্তী স্তম্ভ ইব' বা 'হাতি স্তম্ভের মতো'- এই অবধারণ একটা অনাপেক্ষিক সত্যকে প্রকাশ করে, কিন্তু 'স্যাৎ হস্তী স্তম্ভ ইব' বা 'হাতি স্তম্ভের মতো হতে পারে'- এইরূপ অবধারণ একটা আপেক্ষিক সত্যকে প্রকাশ করে। প্রথম অবধারণ স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে হাতিকে স্তম্ভের মতো বলে বর্ণনা করে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবধারণ স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হাতিকে স্তম্ভের মতো বলে বর্ণনা করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম প্রকার অবধারণ ঐকান্তিক ও অসত্য, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবধারণ অনৈকান্তিক ও সত্য। সুতরাং জৈন দর্শনে 'স্যাৎ' শব্দ অবধারণের সাপেক্ষ-সদর্থক-রূপকে গ্রহণ করার এবং নিরপেক্ষরূপকে বর্জন করার পক্ষপাতী। তাই আমাদের প্রত্যেক উক্তির সঙ্গে স্যাৎ শব্দ যোগ করা প্রয়োজন। তাছাড়াও সবরকম বিকল্প-সম্ভাবনার কথা মনে রাখাও প্রয়োজন। অতএব কোন বিষয়ে শুধু অস্তি (=আছে) বা নাস্তি (=নাই) বলে নিশ্চয় করা ঠিক

নয়। তার বদলে একই বিষয়ে আরো কতকগুলি সম্ভাবনাকে যুক্ত করতে হয়।

.

স্যাৎ-বাদ বুঝাতে জৈনাচার্যগণ সাতটি পরামর্শ বা বাক্যের প্রয়োগ করেন। প্রত্যেক বাক্যকে এক একটি 'ভঙ্গি' নামে ডাকা হয়। সেকারণে সাত প্রকার বাক্যকে একত্রে সপ্তভঙ্গি বলা হয়। এর পূর্ণনাম 'সপ্তভঙ্গিনয়'। 'ভগবতীসূত্র' অনুযায়ী স্বয়ং মহাবীর 'স্যাৎ অস্তি (সম্ভবত আছে), 'স্যাৎ নাস্তি' (সম্ভবত নেই), 'স্যাৎ অব্যক্তব্যম্' (সম্ভবত অবক্তব্য) এই তিনটি ভঙ্গের উল্লেখ করেছেন। এ কারণে এই ভঙ্গত্রয়কে মূলভঙ্গ বলা হয়। পরবর্তীকালে এই ভঙ্গত্রয়ের পারস্পরিক মিশ্রণে 'সপ্তভঙ্গি নয়ের' উদ্ভব হয়েছে। 'অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অবক্তব্য' এদের মিশ্রণের দ্বারা সাত প্রকার বিধেয় পাওয়া যায়-

.

(১) স্যাৎ অস্তি (সম্ভবত আছে),

(২) স্যাৎ নাস্তি (সম্ভবত নেই),

(৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (সম্ভবত আছেও নেইও),

(৪) স্যাৎ অব্যক্তব্যম্ (সম্ভবত অবক্তব্য),

(৫) স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তব্যম্ চ (সম্ভবত আছেও অবক্তব্যও),

(৬) স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তব্যম্ চ (সম্ভবত নেইও অবক্তব্যও),

(৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তব্যম্ চ (সম্ভবত আছেও, নেইও, অবক্তব্যও)।

.

তর্কশাস্ত্রে গুণ অনুসারে বস্তু বা সত্তার অবধারণ বা পরামর্শকে (judgement) দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- সদর্থক বা ভাববাচক এবং নঞর্থক বা নেতিবাচক বা নিষেধাত্মক। সদর্থক ভঙ্গিতে কোন একটি গুণ বা ধর্ম একটি বস্তু সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়। যেমন 'ঘটোহস্তি' বা ঘটটি আছে। আর নঞর্থক ভঙ্গিতে কোন একটি গুণ বা ধর্ম কোন বস্তু সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়। যেমন 'ঘটো নাস্তি' বা ঘট নেই। জৈন দার্শনিকগণ এই বিভাগের কিছু সংশোধন করে উভয় পরামর্শে 'স্যাৎ' অর্থাৎ 'হয়তো' বা 'সম্ভবত' কথাটি যুক্ত করেন। ফলে উক্ত সাত প্রকার পরামর্শে 'স্যাৎ অস্তি', 'স্যাৎ নাস্তি' এই দু'টি বাক্য অন্তর্গত হয়েছে। কোন দেশে, কালে এবং কোন একটি দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে 'সৎ' (=বিদ্যমান) বলা গেলেও অন্য দেশ, কাল ও দৃষ্টিভেদে সেই বস্তুকে 'অসৎ' (=অবিদ্যমান) বলা যায়। এভাবে অস্তি এবং নাস্তি রূপ প্রথম দু'টি ভঙ্গি পৃথক ব্যাখ্যাত হলে অস্তি এবং

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

নাস্তির একত্র সমাবেশ হওয়াতেই তৃতীয় ভঙ্গিও ব্যাখ্যাত হয়। অস্তি ও নাস্তির বিরোধবশত একত্র প্রাপ্তি সম্ভব না হলে সমাধানের যে প্রকার তা অব্যক্তরূপ চতুর্থ ভঙ্গিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে অস্তির সাথে অব্যক্তব্যতা যোগে পঞ্চম, নাস্তির সাথে অবক্তব্যতা যোগে ষষ্ঠ এবং অস্তি নাস্তি উভয়ের সাথে অবক্তব্যতার যোগে সপ্তম এই তিনটি ভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। এটাই হচ্ছে সংপ্তিভাবে প্রসিদ্ধ জৈন সপ্তভঙ্গিনয়।

.

একাদশ শতকের দিগম্বর জৈন দার্শনিক অনন্তবীর্য তাঁর 'পরীক্ষামুখপঞ্জিকা বা প্রমেয়রত্নমালা' গ্রন্থে সপ্তভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-
'তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতি গতির্ভবেৎ।

স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাত্তন্নিষেধে বিবক্ষিতে।।

ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্ ।

যুগপত্তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ।।

আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে।

অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ।।

সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে।।' ইতি।- (পরীক্ষামুখপঞ্জিকা)

অর্থাৎ :
কোন বস্তুর বিধান বা অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চাইলে 'স্যাদস্তি' এরূপ বলা হবে। তার নিষেধ প্রতিপাদনে 'স্যান্নাস্তি'। ক্রমে দু'টি বলতে 'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ' প্রয়োগ হবে। দু'টিকে একসঙ্গে বলতে বিরোধ হলে 'স্যাদবাচ্য' প্রয়োগ হবে। প্রথমটি (অবক্তব্য) বুঝাতে পঞ্চম ভঙ্গি, দ্বিতীয়টি (নাস্তিত্ব) ও অবাচ্যত্ব বুঝাতে ষষ্ঠ ভঙ্গি, অস্তিত্ব নাস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্বের সমুচ্চয় বুঝাতে সপ্তম ভঙ্গি প্রযুক্ত হবে।
(নাস্তিকদর্শন পরিচয়/ ড. বিশ্বরূপ সাহা।) যেমন-

(১) স্যাদস্তি (কিছুর অপেক্ষায় কোন বস্তু আছে)- এটি হচ্ছে প্রথম পরামর্শ। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় 'ঘটোহস্তি' তবে তার অর্থ হবে কোন বিশেষ দেশ, কাল ও

প্রসঙ্গে ঘটটি আছে। এটি একটি ভাবাত্মক বাক্য বা পরামর্শ।
(২) স্যান্নাস্তি (কিছুর অপেক্ষায় কোন বস্তু অবিদ্যমান)- এটি অভাবাত্মক পরামর্শ। উপাদান, স্থান, কাল ও পটাদি অন্য বস্তুর স্বরূপে ঘট বিদ্যমান নয়।
(৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ (কিছুর অপেক্ষায় কোন বস্তু একসাথে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়বিধ)। কোনভাবে ঘট আছে ও তা নেই।

(৪) স্যাদ্ অবক্তব্যঃ (কিছুর অপেক্ষায় বস্তুর স্বরূপ নির্দিষ্ট করা যায় না)। যদি কোন পরামর্শে পরস্পর বিরোধী গুণের সম্বন্ধে একসাথে বিচার করা হয় তবে সেই বিষয়ে 'অবক্তব্য' শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। এটি হচ্ছে চতুর্থ পরামর্শ।
(৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ (কিছুর অপেক্ষায় বস্তুটি আছে তথা অনির্দিষ্ট হবে)। বস্তু একই সময়ে থাকতে পারে অথচ নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।
(৬) স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ (কিছুর অপেক্ষায় বস্তুটি নেই তথা তার রূপনির্দিষ্ট করা যায় না)। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গি যোগে এই ষষ্ঠ পরামর্শটি হয়েছে।
(৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ। তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গি যুক্ত করে অর্থাৎ অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্বের সমুচ্চয় করে এই সপ্তম ভঙ্গরূপ পরামর্শটি তৈরি হয়েছে।
.
বিষয়টিকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে আরেকটু স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে।
(১) স্যাৎ অস্তি : 'স্যাৎ অস্তি' হলো জৈন যুক্তিবিজ্ঞানের সকল প্রকার সদর্থক অবধারণের সাধারণ রূপ। সদর্থক অবধারণ কোন একটি বস্তুতে কোন একটি গুণ বা ধর্মের অস্তিত্বকে সূচনা করে।
যেমন, প্রথম অবধারণ বা পরামর্শের দৃষ্টান্ত হলো 'ফলটি সবুজ'। এই পরামর্শকে প্রকাশ করতে গিয়ে জৈন দার্শনিকরা বলেন 'হয়তো ফলটি সবুজ' বা একদিক থেকে ফলটি সবুজ। এর অর্থ হলো কোন নির্দিষ্ট স্থানে ফলটি সবুজ হলেও, সবসময় ফলটি সবুজ নাও হতে পারে। এই কারণে সব সদর্থক পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি'।

(২) স্যাৎ নাস্তি : দ্বিতীয়ত, 'স্যাৎ নাস্তি' হলো জৈন যুক্তিবিজ্ঞানের সকল প্রকার নঞর্থক অবধারণের সাধারণ রূপ। নঞর্থক অবধারণ কোন একটি বস্তুতে কোন একটি গুণ বা ধর্মের অনস্তিত্ব সূচনা করে।
যেমন, নিষেধাত্মক পরামর্শের দৃষ্টান্ত হলো 'ফলটি সবুজ নয়'। এই পরামর্শটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে জৈন দার্শনিকরা বলেন 'হয়তো ফলটি সবুজ নয়'। এর অর্থ হলো কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফলটি সবুজ হলেও সবসময় ফলটি সবুজ নাও হতে পারে। এই কারণে জৈনমতে সব নঙর্থক পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ নাস্তি'।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

(৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ : তৃতীয় প্রকার 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ' একই সঙ্গে একটি বস্তুর সদর্থক ও নঞর্থক ধর্ম বা গুণ প্রকাশক অবধারণের সাধারণ রূপ। জৈনমতে সদর্থক অবধারণ যেমন একটি বস্তুতে কোন একটি ধর্ম বা গুণের স্বীকৃতি বোঝায়, তেমনি নঞর্থক অবধারণ সেই বস্তুতে অপর কোন ধর্ম বা গুণের অস্বীকৃতি বোঝায়। এই দুইপ্রকার অবধারণ ছাড়াও একটি অবধারণ একই সঙ্গে একই স্থানে কোন একটি বস্তুতে কোন একটি ধর্মের স্বীকৃতি ও অন্য একটি ধর্মের অস্বীকৃতি বোঝাতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবধারণটি স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির সংযুক্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, পরামর্শটি হলো 'ফলটি সবুজ আবার সবুজ নয়'। জৈন মত অনুযায়ী প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে 'হয়তো ফলটি সবুজ এবং সবুজ নয়'। একটি ফল প্রথমে সবুজ থাকে, পরে পাকলে হলদে হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ আবার সবুজ নাও থাকতে পারে। কোন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করতে হলে অথবা বস্তুর সদর্থক ও নঙর্থক ধারণাকে সামগ্রিকভাবে জানতে হলে এই জাতীয় পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ'।

(৪) স্যাৎ অবক্তব্যম্ : জৈন যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীকৃত চতুর্থপ্রকার অবধারণের রূপ হলো 'স্যাৎ অব্যক্তম্'। স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে সর্বাবস্থায় কোন একটি বস্তুতে কোন একটি ধর্মের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি সম্ভব নয়।

যেমন, ফলটি কখনো সবুজ, কখনো হলুদ, এই অবস্থায় যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, সকল অবস্থায় ফলটির বর্ণ কী ? সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, সকল অবস্থায় ফলটির বর্ণ কী তা বলা যায় না। অর্থাৎ তা হলো অবক্তব্য। এই কারণে চতুর্থ পরামর্শের সাধারণ রূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'স্যাৎ অব্যক্তব্যম্'। এই ধরনের পরামর্শ নির্দেশ করে যে সাধারণভাবে যে কোন বস্তুই অনির্বচনীয়। যদিও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, উক্ত বক্তব্যের দ্বারা বোঝানো হয় যে এমন অনেক দার্শনিক সমস্যা আছে যার সরাসরি কোন উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম একই বস্তুতে আরোপ করা চলে না- জৈন দার্শনিকরা এই সত্য স্বীকার করেন এবং সেই কারণে জৈনরা বিরোধবাধক নিয়ম ভঙ্গ করেন- এই অভিযোগ সত্য নয়। বরং একথা বলা চলে যে, বিরোধবাধক নিয়ম তাঁরা মেনে চলেন। সেই কারণেই তাঁরা স্বীকার করেন যে পরস্পর বিরুদ্ধ দু'টি ধর্মকে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন বস্তুর উপর একই সময়ে আরোপ করা চলে না।

(৫) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্ চ : জৈনদের পঞ্চম প্রকার অবধারণের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'। প্রথম প্রকার অবধারণের সঙ্গে চতুর্থ প্রকার অবধারণ যুক্ত করলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। দেশ-কাল সাপেক্ষে যখন কোন একটি বস্তুতে কোন একটি গুণ বা ধর্মের স্বীকৃতি বোঝানো হয় এবং দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে ঐ বস্তুটিকে অবর্ণনীয় বলে প্রকাশ করা হয়, তখন এইরূপ অবধারণের উদ্ভব হয়। যেমন, ফলটি বিশেষ বিশেষ সময়ে সবুজ। কিন্তু সব অবস্থায় ফলটি কী রকম তা বর্ণনা করা যায় না। এই কারণে জৈনরা বলেন 'হয়তো ফলটি সবুজ এবং অবক্তব্য'। তাই পঞ্চম পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'।

(৬) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ : জৈনদের ষষ্ঠ প্রকার অবধারণের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'। দ্বিতীয় প্রকার অবধারণের সঙ্গে চতুর্থ প্রকার অবধারণ যুক্ত করলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। এই প্রকার অবধারণের ক্ষেত্রে দেশ-কাল সাপেক্ষে একটি বস্তুতে কোন ধর্মের অবিদ্যমানতা এবং দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে ঐ ধর্মের অবর্ণনীয়তাকে প্রকাশ করা হয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ফলটি সময় বিশেষে সবুজ নয়, কিন্তু সব অবস্থায় ফলটি কী রকম তা বর্ণনা করা যায় না। এই কারণে এই পরামর্শটিকে প্রকাশ করতে হলে আমাদের বলতে হয় 'হয়তো ফলটি সবুজ নয় এবং অবক্তব্য'। তাই ষষ্ঠ প্রকার পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'।

(৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ : জৈনদের সপ্তম প্রকার অবধারণের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'। তৃতীয় প্রকার অবধারণের সঙ্গে চতুর্থ প্রকার অবধারণ যুক্ত করলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। কোন একটি বস্তুতে নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে যখন কোন একটি গুণ বা ধর্মের স্বীকৃতি আবার ভিন্ন কোন স্থানে বা কালে ঐ বস্তুতে ঐ ধর্ম বা গুণের অস্বীকৃতি এবং দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে ঐ বস্তুর অবর্ণনীয়তাকে প্রকাশ করা হয় তখন এইরূপ অবধারণের উদ্ভব হয়।

যেমন, ফলটি সময় বিশেষে সবুজ অথবা সময় বিশেষে সবুজ নয় এবং সব অবস্থায় ফলটি কী তা বলা যায় না। এই বক্তব্য প্রকাশ করতে বলা হয়েছে 'হয়তো ফলটি সবুজ এবং সবুজ নয় এবং অবক্তব্য'। তাই সপ্তম প্রকার পরামর্শের সাধারণ রূপ হলো 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্ চ'।

শিক্ষক –রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

.

সুতরাং জৈনমতে 'নয়' বা শর্তাধীন পরামর্শের সংখ্যা সাত। এই মতে যদিও কোন বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে তবুও কোন বস্তুর বর্ণনা করতে হলে এই সাতপ্রকার পরামর্শের মধ্যে যে কোন একটিকে ব্যবহার করতে হবে। পরামর্শের সংখ্যা সাতের বেশি কখনও হতে পারবে না। ফলে বলা যায় যে, কোন পরামর্শ করার সময় যদি ঐকান্তিকভাবে করা হয় এবং আপেক্ষিকভাবে করা না হয় তাহলে সেই পরামর্শ মিথ্যা 'নয়' বা নয়া–ভাস।

.

প্রশ্ন হতে পারে, জৈনদর্শনে সপ্তভঙ্গি নয়ে কেন 'স্যাৎ' বাক্যের সংখ্যা কেবল সাতটিই স্বীকার করা হয়েছে ? জৈনদের সাতটি বাক্যে নিয়ত থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেননা অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য পদগুলিকে 'স্যাৎ' এই অব্যয়ের সাথে যোগ করে ব্যস্ত ও সমস্তভাবে সাতটিই ভেদ হবে, সাতের কম বা বেশি বাক্য সম্ভব নয়।

.

স্যাৎ–বাদকে সন্দেহবাদ (scepticism) বলা যায় না। কেননা সন্দেহবাদ জ্ঞানের সম্ভাবনায় সন্দেহ করে। কিন্তু জৈনগণ জ্ঞানের সম্ভাবনার সত্যতায় বিশ্বাস করেন। তাঁরা পূর্ণজ্ঞানের সম্ভাবনাতেও বিশ্বাস করেন। সাধারণ জ্ঞানের সম্ভাবনায় স্যাৎবাদ সন্দিগ্ধ নয়। অতএব স্যাৎবাদকে সন্দেহবাদ বলা সঙ্গত নয়।

.

জৈনমতে স্থান, কাল ও দৃষ্টিকোণের উপর জ্ঞান ও জ্ঞানের আকার নির্ভর করে। সেকারণে স্যাৎবাদকে সাপেক্ষবাদ বলা যায়। জৈনমতে বস্তুর অনন্ত গুণ স্বীকার করা হয। এই গুণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের উপর বা জ্ঞাতার মনের উপর আদৌ নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলে জৈন দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন। তাঁরা বস্তুর বাস্তবিকতায় বিশ্বাসী। এরূপ মতবাদ বস্তুবাদের (realism) তুল্য এবং তাই ভারতীয় দর্শনে জৈনগণকে বস্তুবাদী দার্শনিকের তুল্য পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

.

স্যাদবাদের সমালোচনা

স্যাৎবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় বিভিন্ন দার্শনিক পক্ষ থেকে অনেক আক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন–

.

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

১) বৌদ্ধ ও বেদান্তী দার্শনিকরা স্যাৎবাদকে বিরোধাত্মক সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। জৈনগণ বিরোধাত্মক গুণকে একসাথে সমন্বয় করেছেন। রামানুজের মতে সত্তা ও নিঃসত্তাকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম আলো ও অন্ধকারের মতো একত্রিত করা যায় না। শঙ্করাচার্যের মতে (ব্রহ্মসূত্র: ২/২/৩৩) যে পদার্থ অবক্তব্য তা কিভাবে বলা যায়। বলা হচ্ছে এবং বলা যায় না, এই দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী। সেকারণে তিনি স্যাৎবাদকে পাগলের প্রলাপ বলেছেন।

.

২) বেদান্তী দার্শনিকদের মতে স্যাৎবাদ অনুযায়ী যদি সকল বস্তুই সম্ভবমাত্র হয়, তবে স্যাৎবাদ স্বয়ংই সম্ভবমাত্র হয়ে যাবে। ফলে স্যাৎবাদ হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু এরূপ কোন সিদ্ধান্ত সমীচীন হতে পারে না।

.

৩) মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট প্রমুখ সমালোচক মনে করেন, জৈনদের সপ্তভঙ্গি নয়ের শেষ তিন প্রকার নয় অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্যমাত্র। সেগুলি কেবল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নয়ের সঙ্গে চতুর্থ নয়ের সংমিশ্রণ। এজাতীয় সংযুক্তি যদি স্বীকার করা হয় তাহলে এভাবে শত শত নয় পাওয়া সম্ভব। তাই কেবলমাত্র প্রথম চারটি নয়ের যৌক্তিকতা স্বীকার করা যেতে পারে।

.

৪) প্রথম চারপ্রকার নয়ও জৈনরা আবিষ্কার করেন নি। বেদান্ত দর্শনে চারটি কোটীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে- সৎ, অসৎ, সদসৎ ও সদসৎ ভিন্ন। বৌদ্ধ দর্শনেও এই চারটি কোটী ভিন্ন তত্বকে শূন্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে জৈন সিদ্ধান্ত নতুন কোন তত্ব নয়।

.

৫) স্যাৎবাদ অনুসারে আমাদের সকল কিছু সাপেক্ষ ও আংশিক। জৈনগণ কেবল সাপেক্ষকে স্বীকার করেন, নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করেন না। নিরপেক্ষের অভাবে স্যাৎবাদের সাতটি পরামর্শ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাদের সমন্বয় সম্ভব নয়।

.

৬) জৈনদর্শনে কেবলজ্ঞানে বিশ্বাস করা হয়েছে। কেবলজ্ঞান সত্য, বিরোধশূন্য ও সংশয়শূন্য মনে করা হয়। এই জ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। কিন্তু কেবলজ্ঞানে বিশ্বাস করে জৈনগণ নিরপেক্ষ জ্ঞানে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সাপেক্ষ সত্যের সমাহারকে পূর্ণ সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সাপেক্ষ সত্য যোগ করলে কি করে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ সত্য পাওয়া যায় তা বোঝা যায় না। জৈনরা দিয়েছেন ভেদ ও অভেদের জ্ঞান।

ভেদের মধ্যে অভেদের ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। ফলে সাপেক্ষতার নামান্তর এই স্যাৎবাদ সিদ্ধান্তটি অসঙ্গত হয়ে যায়।

২.২ : জৈন জ্ঞানতত্ব

...
প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক তর্ক ও বিতণ্ডায় প্রমাণ ও তর্কশাস্ত্র হলো নিজ নিজ দার্শনিক বিবেচনার মোক্ষম অস্ত্র, যা দিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের পাশাপাশি নিজের যুক্তি ও মত প্রতিষ্ঠিত করায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তা থেকে জৈন দার্শনিকরাও কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। বরং প্রমাণশাস্ত্র জৈনদর্শনের এক মহত্বপূর্ণ শাখা। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন জৈন দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ অবদানে জৈনদর্শনের যে বিশেষ বিকাশ ঘটে, তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন হলো জৈনদের এই প্রমাণশাস্ত্র যা মূলত ভারতীয় দর্শনকেই একাধারে মহিমান্বিত করেছে।

.
২.২.১ : জ্ঞান

জৈনদর্শনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যখন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বস্তুবাদী হিসেবে জৈনরা চেতনার বাইরে বহির্বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য তা মৌলিক। মন বা চেতনা কোনভাবেই অচেতন বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে না। চেতনা বস্তুকে প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুর সৃষ্টি বা রূপান্তরের ক্ষেত্রে চৈতন্যের কোন ভূমিকা নেই।
.

জৈনমতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ বা স্বাভাবিক গুণ। এই চৈতন্যের উপমা দেয়া হয় সূর্যের সাথে। সূর্যের প্রকাশ থেকে অন্য বস্তুরাজির প্রকাশের (=দৃশ্যমান) সাথে সাথে যেমন সূর্য নিজেও প্রকাশ হয়, তেমনি স্বরূপত চৈতন্যময় আত্মা যখন বহির্জগৎ ও আন্তর্জগতের সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের বহির্বিষয় ও আন্তরবিষয়ের জ্ঞান হয়। এই মতে প্রতিটি আত্মা স্বরূপত সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ জীবকে অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট বলে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু কর্মের আবরণে জীবের শুদ্ধ চৈতন্যরূপ আচ্ছাদিত থাকে। জীবের কর্ম বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পরিমাণে স্বাভাবিক চৈতন্যকে আবৃত করে বা চৈতন্যের প্রকাশে বাধা দান করে। জৈনমতে এমনকি দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনও চৈতন্যের স্বাভাবিক প্রকাশের পরিপন্থী। এর ফলে

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

আত্মা সর্বজ্ঞ হতে পারে না। বদ্ধ জীব সব সময় কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়। এইজন্য বদ্ধজীবের জ্ঞান কম-বেশি সীমিত।

.

জ্ঞানের প্রামাণ্য

জ্ঞানের প্রামাণ্য হলো মূলত জ্ঞানের সত্যতা বা যথার্থতা নির্ণয়। যার মাধ্যমে জ্ঞানের যথার্থতা নির্ণয় করা হয় তা হলো প্রমাণ। জৈনদার্শনিক হেমচন্দ্র সূরি 'প্রমাণমীমাংসা' গ্রন্থে প্রমাণের সংজ্ঞা দিয়েছেন-

'সম্যগর্থনির্ণয়ঃ প্রমাণম্ ইতি।'- (প্রমাণমীমাংসা-২/২)

অর্থাৎ : সম্যকভাবে বিষয়ের নিশ্চয়কে প্রমাণ বলা হয়।

'পরীক্ষামুখসূত্র' গ্রন্থে মাণিক্যনন্দী বলেন-

'হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারসমর্থং হি প্রমাণম্। (পরীক্ষামুখসূত্র-১/১)

অর্থাৎ : হিত বা প্রিয়কে গ্রহণে ও অহিত বা অপ্রিয়কে পরিহারে যা সমর্থ তা হচ্ছে প্রমাণ।

মাণিক্যনন্দীর সূত্রের ব্যাখ্যায় 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড' গ্রন্থে প্রভাচন্দ্র প্রমাণের লক্ষণে বলেন-

'স্বাপূর্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্।

অর্থাৎ : পূর্বে অনধিগত বিষয়ের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণ।

কোনকিছু ত্যাজ্য হলে ত্যাগ করতে, গ্রাহ্য হলে গ্রহণ করতে বা উপেক্ষণীয় হলে উপেক্ষা করতে যা সমর্থ তা-ই প্রমাণ। আর প্রামাণ্য হলো প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগত ধর্ম, যার নামান্তর প্রমাত্ব বা জ্ঞানের যথার্থতা। জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। মীমাংসক-মতে যে কারণ হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণ হতেই জ্ঞানে প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব উৎপন্ন হয় এবং যে কারণ হতে জ্ঞানের জ্ঞান হয় সেই কারণ হতেই জ্ঞানগত প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। এই উভয়স্থলে অন্য কোন সামগ্রীর অপেক্ষা থাকে না, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞপ্তি স্বয়ংপ্রকাশ। একে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ বলে।

অন্যদিকে ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞানে প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানসামান্যের সামগ্রী হতে প্রবৃত্তি-সামর্থ্য নামক অতিরিক্ত গুণকে অপেক্ষা করে। গুণজন্য হলেই জ্ঞানে প্রামাণ্য থাকে অর্থাৎ জ্ঞানটি প্রমা হয়। যেমন জলজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এটা যে মরিচিকা নয়, তা নির্ভর করে তার জ্বলন নিবৃত্তি ও পিপাসা উপশমের সামর্থের উপর। এভাবে প্রমাত্বের জ্ঞানও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হতে অতিরিক্ত সামগ্রীকে অপেক্ষা করে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞান যে-ক্ষণে বস্তুকে প্রকাশ করে সেইক্ষণে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। বিষয় প্রকাশের পরক্ষণে জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। এজন্য ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের জ্ঞানকে বলা হয় 'অনুব্যবসায়'। জ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের (=অনুব্যবসায়ের) দ্বারা গম্য হলে জ্ঞানগত প্রামাণ্যের জ্ঞান 'এই জ্ঞানটি প্রমা, কেননা তা সংবাদিপ্রবৃত্তির জনক' এরূপ অনুমান (=অনুমিতির) দ্বারা গম্য হয়। একে পরতঃপ্রামাণ্যবাদ বলে।

জৈনমতে আত্মা যখন অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করে, তখন তা নিজেকেও প্রকাশ করে। কিন্তু জৈনমতে জ্ঞান যে-ক্ষণে বিষয়কে প্রকাশ করে সেইক্ষণে নিজেকেও প্রকাশ করে। অর্থাৎ জ্ঞান 'স্বয়ংপ্রকাশ'। তবে জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে জৈনদর্শন একই সঙ্গে স্বতঃ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদী বলে পরিচিত, অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন যে জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানাতিরিক্ত শর্তের উপর সবসময় নির্ভরশীল নয়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সাধারণ জীবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও অপরিচিত বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে জৈনরা পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। মুক্ত জীবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পরিচিত বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী। কেননা, জৈনমতে মুক্ত জীবের জ্ঞান তার প্রামাণ্যের জন্য জ্ঞানাতিরিক্ত কোন শর্তের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ তাঁদের সম্মত হচ্ছে উভয়তঃ প্রামাণ্যবাদ। তাই 'পরীক্ষামুখসূত্র' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'তৎপ্রামাণ্যং স্বতঃ পরতশ্চ'। (পরীক্ষামুখসূত্র-১/১৩)

অর্থাৎ : তার (জ্ঞানের) প্রামাণ্য স্বতঃ ও পরতঃ উভয়ই।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

জৈনমতে জ্ঞানের জ্ঞপ্তিতে ও স্বকার্যে অভ্যাস ও অনভ্যাস দশার উপর নির্ভর করে কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকৃত। যেমন, অভ্যাস দশাপন্ন নিজের করতল প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্যতা নিশ্চিত হয়। এই মতে, প্রমাতাকে যদি আর কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য যাচাই করতে না হয়, সকল প্রকারের ব্যভিচার শঙ্কা দূর হলে সর্ববিধ অনুমানেই সর্বথা প্রামাণ্যের স্বতগ্রাহ্যতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনভ্যস্ত দশাপন্ন প্রত্যক্ষ স্থলে প্রামাণ্যের নিশ্চয় পরতঃ হয়। তাই 'পরীক্ষামুখসূত্রে' বলা হয়েছে–

'তত্রাভ্যাসাৎ প্রমাণত্বং নিশ্চিতং স্বত এব নঃ।

অনভ্যাসে তু পরতঃ ইত্যাহুঃ কেচিদঞ্জসা।।'- (পরীক্ষামুখসূত্র)

অর্থাৎ : আমাদের (=জৈনমতে) মতে অভ্যাসদশায় স্বতঃপ্রামাণ্যের নিশ্চয় হয়, কিন্তু অনভ্যাস দশায় পরতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। তবে দৃষ্টার্থ প্রত্যক্ষ স্থলে বিষয়ের অব্যভিচার দুর্জ্ঞেয় বলে প্রামাণ্যের পরতঃ নিশ্চয় সংবাদী প্রবৃত্তিরূপ অনুমান প্রমাণের অধীন হয়ে থাকে।

জ্ঞানের জ্ঞপ্তিতেও অনভ্যাসদশায় প্রামাণ্য স্বতঃ অবস্থান করে না, কেননা সত্য বা অসত্য এরূপ সন্দেহবিপর্যয় দেখা যায়। কিন্তু অভ্যাসদশায় প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই স্বতঃ গৃহীত হয়। তবে অভ্যাসদশায় বিষয়ের প্রতি গমনরূপ প্রবৃত্তিলক্ষণ স্বকার্যে স্বতঃ প্রামাণ্য থাকে না, কেননা তা অপ্রামাণ্যের মতো স্বগ্রহণ সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন– তা 'অসত্য' এই জ্ঞান নিবৃত্তিমূলক স্বকার্যকারী হয়, অন্যক্ষেত্রে (অর্থাৎ অজ্ঞাত হয়ে অভ্যাসদশায়) তা হয় না। এভাবেই জৈনসম্প্রদায় স্বতঃ ও পরতঃ এই উভয়তঃ প্রামাণ্যের উপযোগ গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞানের ভেদ– যথার্থ ও অযথার্থ :

জৈনমতে যে জ্ঞানের দ্বারা ইষ্টলাভ হয় ও অনিষ্ট পরিহার করা হয় সেই জ্ঞান হলো সত্য বা যথার্থ। জ্ঞানের এই যথার্থ নির্ণয় হয় প্রমাণের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে প্রমাণ হলো জ্ঞান-প্রকাশক। জৈনদার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকর বলেছেন–

'বিজ্ঞানম্ স্বপরভাসি প্রমাণম্ বাধবর্জিতম্'। (ন্যায়াবতার)

অর্থাৎ : প্রমাণ হলো তা-ই যা নিজেকে এবং অপর বিষয়কে প্রকাশ করে এবং যা বিরোধমুক্ত।

জৈনমনীষী অকলঙ্ক ও হেমচন্দ্রও যথার্থজ্ঞানকে অনুরূপভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে জৈনমতের সঙ্গে ন্যায়মত ও বৌদ্ধমতের মিল পাওয়া যায়। ন্যায়মতে অর্থপ্রাপকত্ব বা প্রবৃত্তিসামর্থ্য হলো প্রামাণ্যের মাপকাঠি। বৌদ্ধমতে অবিসংবাদিত্ব বা অবাধিতত্ব হলো প্রামাণ্যের মাপকাঠি। জৈনদর্শন মনে করে, যথার্থ জ্ঞান যেমন অর্থপ্রাপক তেমনি আবার অবিসংবাদী। যে জ্ঞান বিষয়ের অযথার্থ রূপকে প্রকাশ করে সে জ্ঞান হলো অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞান। তাই জৈনমতে জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- যথার্থ ও অযথার্থ। কোন কোন জৈন-দার্শনিকের মতে- অবধি, মনঃপর্যায়, কেবল, মতি ও শ্রুত ভেদে যথার্থ জ্ঞান পাঁচ প্রকার। যথার্থ জ্ঞান যেহেতু মিথ্যা জ্ঞান নয়, তাই তাকে শুধু জ্ঞান হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। অন্যদিকে যাতে যা নেই তাতে তার জ্ঞান, অথবা যা যেরূপ নয় তাকে সেভাবে জানা হচ্ছে অযথার্থ জ্ঞান। জৈনমতে স্মৃতি যথার্থ হয়, কিন্তু ন্যায়মতে অযথার্থ স্মৃতিও স্বীকৃত। অযথার্থ বা মিথ্যাজ্ঞান জৈনমতে তিনপ্রকার- বিপর্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসায়।

বিপর্যয় : যে বস্তুতে যা নেই তাতে তার জ্ঞান বা যে যা নয় তাকে সেরূপে জানা হচ্ছে বিপর্যয়। নামান্তরে তাকে ভ্রম বা বিপর্যাসও বলা হয়। 'প্রমাণমীমাংসা' গ্রন্থে হেমচন্দ্র বিপর্যয়ের লক্ষণে বলেছেন-

'অতস্মিংস্তদেবেতি বিপর্যয়ঃ'।

অর্থাৎ : বিপর্যয় হলো বস্তুস্বরূপের বিপরীত জ্ঞান।

আমরা যখন শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষ করি, তখন এরূপ জ্ঞানকে বলা হয় বিপর্যয়। বিপর্যয় প্রকৃতপক্ষে ভ্রমজ্ঞান। সংশয় ও অনধ্যবসায় জ্ঞানের সঙ্গে বিপর্যয়ের পার্থক্য হলো, সংশয় বা অনধ্যবসায় জ্ঞানে আমরা বস্তুর কোন গুণ সম্বন্ধেই নিশ্চিত হই না। কিন্তু বিপর্যয় জ্ঞানে আমরা বস্তুর অযথার্থ গুণকে নিশ্চিতভাবে জেনে থাকি। যখন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি এক চন্দ্রকে দুই চন্দ্র বলে জানেন, কিংবা ভ্রমণজনিত কারণে যখন গতিহীন বৃক্ষাদিকে গতিশীল বলে মনে হয়, তখন এই সকল জ্ঞানকে বলা হয় বিপর্যয়। ন্যায়মতে একে অন্যথাখ্যাতি বলা হয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

সংশয় : একই বিষয়ে যখন উভয় কোটির প্রত্যয় হয় তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় সংশয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে বিকল্পগুলিকে বলা হয় 'কোটি'। সংশয়ের লক্ষণে প্রমাণমীমাংসায় হেমচন্দ্র বলেছেন–

'অনুভয়ত্রোভয়কোটিস্পর্শী প্রত্যয়ঃ সংশয়ঃ'।

অর্থাৎ : একই সাথে উভয় কোটিস্পর্শী প্রত্যয় হচ্ছে সংশয়।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম সংশয়কে 'বিমর্ষ' বলেছেন। বিমর্ষ হলো অনবধারণ জ্ঞান। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত অবধারণ থাকে না, তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় সংশয়। হেমচন্দ্রের লক্ষণের সঙ্গে গৌতম-প্রদত্ত সংশয়ের লক্ষণের বহুলাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে প্রাচীন ন্যায়ে সংশয়ের কোটি বিষয়ে মতভেদ আছে। ক্ষেত্র বিশেষে নৈয়ায়িকগণ দুই-এর অধিক কোটি স্বীকার করেছেন। হেমচন্দ্রের লক্ষণে অবশ্য উভয় (দুই) কোটির কথাই বলা হয়েছে।

.

অন্ধকারে যখন আমরা দূর থেকে উর্ধ্বাকার কোন বস্তুকে দেখে সাধক ও বাধক প্রমাণের অভাব হলে 'এটি স্থাণু (নির্জীব বস্তু) বা পুরুষ' এরূপ অনিশ্চিত-অবধারণ বা অনবধারণযুক্ত হই, তখন এই জ্ঞানকে বলা হয় সংশয়। তাতে সংশয়ের নিরাকরণের জন্য জৈন স্যাদবাদের অনেকান্তিক যুক্তিতে 'ঘট আছে ও নেই', 'আত্মা নিত্য ও অনিত্য' ইত্যাদি ভঙ্গিও প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের অনবধারণের রূপ হলো- 'স্থাণুর্বা বা পুরুষো বা অয়ম্', 'অস্তি বা নাস্তি বা ঘটঃ', 'নিত্য বা অনিত্য বা আত্মা' ইত্যাদি। মোটকথা, সংশয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোটিদ্বয়ের মধ্যে কোনোটি সম্বন্ধেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। এরকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মন একটা অস্বস্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

অনধ্যবসায় : অনধ্যবসায় হলো বস্তুর 'অনিশ্চিত সামান্য জ্ঞান'। প্রমাণমীমাংসায় অনধ্যবসায়ের লক্ষণে হেমচন্দ্র বলেছেন–

'বিশেষানুল্লেখ্যনধ্যবসায়ঃ'।
অর্থাৎ : বিশেষের অনুল্লেখী হচ্ছে অনধ্যবসায়।

এইরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বোধ হয় না। পথ চলতে চলতে অন্ধকারে যখন কোন কিছুর স্পর্শ আমাদের পায়ে অনুভূত হয়, তখন প্রশ্ন জাগে- এটা কী ? এক্ষেত্রে বস্তুর নিছক স্পর্শগত বোধ আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা আমাদের হয় না। দূর, অন্ধকার প্রভৃতির দরুন অসাধারণ ধর্মের প্রশ্নমূলক অনিশ্চয়াত্মক প্রত্যয় হলো অনধ্যবসায়। যেমন 'এটি কী ?' অন্যেরা প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য জ্ঞান মনে করলেও অনির্দেশ্যতার কারণে এটি অনধ্যবসায়, কেননা এখানে বিশেষের উল্লেখ হয় না। বৈশেষিক দর্শনেও এরূপ অনধ্যবসায়ের নাম অবিদ্যা (=অযথার্থ জ্ঞান) স্বীকৃত হয়েছে। এই জ্ঞান ঔদাসীন্যের দরুন উৎপন্ন হয়।

.

২.২.২ : জ্ঞানের বিভাগ

অন্যান্য দর্শনের মতোই জৈনগণও প্রমাণজন্য বা যথার্থ জ্ঞানকে পরোক্ষ (mediate) ও অপরোক্ষ (direct, imediate) ভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন।
জ্ঞান নিজেকে ও অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞান বাধারহিতভাবে উৎপন্ন হলে প্রমাণ (=নিশ্চিত জ্ঞান) বলে বিবেচিত হয়। প্রমেয় বিষয় যে প্রকারে প্রকাশিত হয় সে অনুসারে কোন জ্ঞানকে অপরোক্ষ (=প্রত্যক্ষ) এবং কোন জ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয়। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি লব্ধ জ্ঞানকে অপরোক্ষ এবং অনুমানাদিকে পরোক্ষজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে জৈনমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য দর্শনের সাথে এখানে পার্থক্য হলো, ইন্দ্রিয় ও মনের সহযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে জৈনমতে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়, প্রত্যক্ষ নয়। আর আত্মসাপেক্ষ জ্ঞান হচ্ছে অপরোক্ষ।

জৈনমতে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হলো পরোক্ষজ্ঞান। আর অপরোক্ষজ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা লব্ধ না হয়ে সরাসরি আত্মার দ্বারা লব্ধ। বিভিন্ন জৈনশাস্ত্রে জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। জৈনগণ জ্ঞানের বিভাগের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি ভিন্ন ধারা অনুসরণ করেছেন। একটি হলো আগমিক এবং অপরটি হলো যৌক্তিক। আগমিক বিভাগ আবার বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন রকমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন-
'ভগবতিসূত্রে' বলা হয়েছে বলা হয়েছে, জ্ঞান পাঁচপ্রকার- (১) অভিনিবোধিক, (২) শ্রুত, (৩) অবধি, (৪) মনঃপর্যায় ও (৫) কেবল।

আবার 'স্থানাঙ্গসূত্রে' জ্ঞানকে প্রথমে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। অবধি,

মনঃপর্যায় ও কেবলজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিনিবোধিক ও শ্রুত জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়েছে।

অন্যদিকে যৌক্তিক দিক থেকে জৈনগণ যথার্থ জ্ঞানকে প্রাথমিকভাবে দুইভাগ করেছেন- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর পরোক্ষ জ্ঞানের করণ দুই প্রকার- অনুমান ও শব্দ। সুতরাং জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ভেদে তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়। প্রত্যক্ষ হচ্ছে সকলের স্বীকৃত প্রমাণ। লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে জৈনরা অনুমানকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন এবং তীর্থঙ্করদের উপদেশবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে মনে করেন। শব্দের অন্য নাম হচ্ছে আগম।

প্রত্যক্ষজ্ঞান আবার দুই প্রকার- সাংব্যবহারিক ও মুখ্য। মুখ্যজ্ঞান তিনপ্রকার- অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবলজ্ঞান। আর সাংব্যবহারিক-প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার- মতি জ্ঞান ও শ্রুত জ্ঞান। অপরদিকে পরোক্ষজ্ঞান পাঁচপ্রকার- স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান ও আগম। ফলে সাধারণভাবে প্রচলিত অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রমাণ জৈনদর্শনে স্বীকৃত কি না তাও পরিষ্কার নয়। মনে করা যেতে পারে যে, জৈন দার্শনিকগণ আগমীয় ধারাকে অনুসরণ করে জ্ঞানকে মূলত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ- এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণকেই স্বীকার করেন।

আবার পরোক্ষজ্ঞান প্রধানত দুই প্রকার- মতি ও শ্রুত। এই দুইপ্রকার জ্ঞান ছাড়াও অকলঙ্ক প্রভৃতি জৈন দার্শনিকগণ স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান এবং আগমকেও পরোক্ষজ্ঞান বলে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, জৈনমতে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক প্রভৃতিও প্রমাণ। যদিও জৈনদার্শনিক উমাস্বাতি অনুমানাদিকে পৃথক প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। কিন্তু সিদ্ধসেন শব্দ ও অনুমানকে পরোক্ষজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মতি ও শ্রুত এই দুইপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান জৈনদর্শনে 'সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষজ্ঞান' বলে পরিচিত। এই দুই প্রকার জ্ঞান তাই যেমন পরোক্ষজ্ঞানের প্রকাররূপে আলোচিত হয়, তেমনি আবার প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকাররূপেও আলোচিত হয়। জৈনমতে

অপরোক্ষজ্ঞান তিন প্রকার- অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবলজ্ঞান। সাধারণ জীব যেহেতু মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করে থাকে, সেহেতু পরোক্ষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানও বলা হয়। এইদিক থেকে শ্রুত ও মতি জ্ঞানকে সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল জ্ঞানকে অসাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যেতে পারে। সংক্ষেপে জৈনদর্শন-স্বীকৃত এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান হলো-

'মতিশ্রুতাবধি মনঃপর্য্যায়কেবলানি জ্ঞানমিতি'।

অর্থাৎ : জ্ঞান পাঁচপ্রকার- মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল জ্ঞান।

জৈনদর্শনে আগমিক ও যৌক্তিক এই দুটি ধারায় জ্ঞানের বিভাগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জৈনদার্শনিকদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকলেও পর্যালোচনার সুবিধার্থে আমরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি।

জৈনমতে যথার্থ জ্ঞান দুই প্রকার- (ক) প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও (খ) পরোক্ষ জ্ঞান।

(ক) প্রত্যক্ষ জ্ঞান

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপলব্ধিতে আত্মা স্বয়ং কারণ হয় এবং তার জন্য পদার্থের প্রয়োজন হয় না। বলা হয়ে থাকে, যা কেবল আত্মার যোগ্যতাবশত উৎপন্ন হয়, তার জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে মাণিক্যনন্দীর 'পরীক্ষামুখসূত্রে' বলা হয়েছে-

'বিশদং প্রত্যক্ষস্য লক্ষণম্'।- (পরীক্ষামুখসূত্র-২/৩)

অর্থাৎ : বিশদ-ই প্রত্যক্ষের লক্ষণ।

এখানে বিশদ অর্থ বলা হচ্ছে স্পষ্ট, যার প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রতীতির দরকার হয়

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

না। অর্থাৎ স্পষ্ট যে জ্ঞান তাকে প্রত্যক্ষ বলে। জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিন প্রকার- অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল।

(১) অবধি জ্ঞান : অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অতীত, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম ও বহু দূরবর্তী বস্তুর যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে বলে অবধি। সাধারণভাবে জীব ইন্দ্রিয়াদির নিকট সমুপস্থিত বস্তুরই জ্ঞান লাভ করে। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়াদির নিকট সমুপস্থিত নয়, সেই সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে না। কিন্তু 'অবধি' নামক জ্ঞানে জীব, যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়াদির কাছে সমুপস্থিত নয় সেই সকল বস্তুরও জ্ঞান লাভ করতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে দূরদর্শন বলা হয়ে থাকে।

অবধি হচ্ছে সীমা। এজন্যে এই জ্ঞান হচ্ছে অবধিজ্ঞান। কর্মের বাধা অপসৃত হলে বিশেষ স্থান, কাল পর্যন্ত অবচ্ছিন্ন বস্তুর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অবধি জ্ঞান। নিজের কর্মকে অংশত নষ্ট করলে পর মানুষ এমন শক্তিলাভ করে যে সে দুরস্থ, সূক্ষ্ম বস্তুরও জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে।

অবধি জ্ঞান আবার দুই প্রকার- ভবপ্রত্যয় ও গুণপ্রত্যয়। জন্মসিদ্ধ অনুরূপ জ্ঞান হচ্ছে ভবপ্রত্যয় এবং তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা আচরণীয় কর্মের কিছু ক্ষয় হলে লব্ধ অনুরূপ জ্ঞানকে গুণপ্রত্যয় বলে। এর মধ্যে দেবতা ও নরকবাসীদের পাখির মতো আকাশে গমনের জ্ঞান হচ্ছে ভবপ্রত্যয়, আর মানুষ ও তির্যক (যারা মানুষের মতো সোজা না হেঁটে বাঁকা হাঁটে এমন বুদ্ধিহীন নিম্নজাতির জানোয়ার) প্রাণীদের গুণপ্রত্যয় হয়।

(২) মনঃপর্যায়জ্ঞান : যে অসাধারণ জ্ঞানের দ্বারা কোন ব্যক্তি অপরের মনোগত বিষয় বা মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে তাকে মনঃপর্যায় জ্ঞান বলে। অপরের মানসিক অবস্থা বলতে ভিন্ন কোন ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, চিন্তা ও ভাবনার কথা বোঝানো হয়েছে। জীব আপন চেষ্টায় অপরের এই সকল মানসিক অবস্থাকে সরাসরি জানতে পারে। সাধারণত দূরশ্রবণ বলতে যে ধরনের জ্ঞানকে নির্দেশ করা যায়, মনঃপর্যায় সেই ধরনের জ্ঞান।

মানুষ রাগদ্বেষ প্রভৃতি মানসিক বাধাকে জয় করতে পারলে অন্যের মনোগত ভূত ও

ভবিষ্যৎ বিষয়ের পরিষ্কার ও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই জ্ঞানের সাথে নৈয়ায়িকদের অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য রয়েছে।

(৩) কেবলজ্ঞান : বস্তুর সরাসরি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সর্বজ্ঞাপক জ্ঞান হলো কেবলজ্ঞান। স্বরূপত সর্বজ্ঞ আত্মা যখন কর্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের বাধাকে অতিক্রম করে বস্তুকে সরাসরি জানে তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় কেবলজ্ঞান। কেবলজ্ঞান জৈন দর্শনে যেমন জ্ঞানতত্ত্বের সর্বোচ্চস্তর তেমনি জৈনদের নৈতিক জীবনেরও সর্বোচ্চ আদর্শ। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। কর্মবন্ধনমুক্ত সিদ্ধপুরুষই কেবলমাত্র সর্ব বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেবলজ্ঞান দেশ ও কালের সীমানা দ্বারা সীমিত নয়। শুদ্ধ পরিপূর্ণ এই জ্ঞানকে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেলে জীব পূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই জ্ঞান কেবল মুক্ত জীবের হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জন্য তপস্বীরা তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করে, অন্য সকল জ্ঞানের অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন সেই স্বয়ং প্রকাশিত নির্বাধ স্পষ্ট জ্ঞানই হচ্ছে কেবল জ্ঞান। জৈনমতে জিন বা তীর্থঙ্কররা এই জ্ঞানের অধিকারী। নিরন্তর কঠোর তপস্যা এবং সম্যগদর্শন, সম্যগজ্ঞান ও সম্যকচরিত্র এই ত্রিরত্নের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে ধ্যানের শক্তিতে জ্ঞানের আবরক ঘাতীয় কর্মের ক্ষয় হয়ে চেতনাস্বভাব আত্মার স্বরূপের আবির্ভাবকে কেবল জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের অন্য নাম মুখ্য প্রত্যক্ষ এবং একেই মোক্ষের সাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞান বলে।

অন্যভাবে আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার- ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ ও পারমার্থিক প্রত্যক্ষ। পারমার্থিক জ্ঞান মন বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা কর্মজনিত ফল হতে উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। কোন ব্যক্তি কর্মজনিত শৃঙ্খল হতে মুক্ত না হলে এজাতীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সুতরাং পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য তাকে অপরিহার্যভাবে কর্মের ধ্বংস করতে হয়। ব্যবহারিক জ্ঞান মন ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলে স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক জ্ঞান হতে ভিন্ন। সাধারণ লোক ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান যে কোন ব্যক্তিমাত্রের প্রাপ্য হতে পারে না। রাগ ও ঈর্ষা হতে মুক্ত অর্হৎ-ব্যক্তিই পারমার্থিক জ্ঞানের অধিকারী হয়।

পারমার্থিক জ্ঞান আবার দুই প্রকার- কেবল ও বিকল জ্ঞান। ঘাতীয় ও অঘাতীয় কর্মের ফল হতে মুক্ত হলে নিসর্গত যে পারমার্থিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় তা সমস্ত বিষয়ের প্রমা জ্ঞান হলে তাকে কেবল (বা সকল) জ্ঞান বলে। কেবল জ্ঞান সমস্ত প্রকার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। আর কোন বিশেষ বিষয়ের সেরূপ জ্ঞান হলে তাকে বিকল পারমার্থিক জ্ঞান বলে। এই বিকল পারমার্থিক জ্ঞান দুই প্রকার- অবধি ও মন-পর্যায়।

জৈনমতে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান চার প্রকার- অবগ্রহ, ঈহা, অবায় ও ধারণা। কোন কিছুকে পৃথক করে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাকে অবগ্রহ বলে। যেমন 'তিনি পুরুষ', এই জ্ঞান হচ্ছে অবগ্রহ।

এরপর 'এই ব্যক্তি কি সিলেটি না ঢাকাইয়া' এরূপ সংশয় হলে 'এ নিশ্চয়ই সিলেটি' এধরনের যে জ্ঞান হয় তা হচ্ছে ঈহা। তবে এ জ্ঞান নিশ্চয় নয়, তাকে উৎপ্রেক্ষা বলা হয়।
তারপর তার ভাষা ইত্যাদি জানার ফলে 'এ হচ্ছে সিলেটি' এরকম যে জ্ঞান হয় তা হচ্ছে অবায়।
এরপর সেই বিষয়েরই পুনরায় যে জ্ঞান সংস্কারকে উৎপন্ন করে তা হলো ধারণা। এই ধারণার দরুন সেই বিষয়ের স্মরণ বা স্মৃতি হয়। তবে এই চার প্রকার জ্ঞানকে পরোক্ষ মতি জ্ঞানের চারটি স্তর বা জ্ঞানের প্রক্রিয়াও বলা হয়।

(খ) পরোক্ষ জ্ঞান

প্রমেয় বিষয় যে প্রকারে জ্ঞানে প্রকাশিত হয় সে অনুসারে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলা হয়। জৈনদার্শনিক মানিক্যনন্দীর 'পরীক্ষামুখসূত্রে' বিশদকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ বলে প্রত্যক্ষ ভিন্নকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়েছে-

'পরোক্ষমিতরৎ'।- (পরীক্ষামুখসূত্র-২/৩/১)

অর্থাৎ : পরোক্ষ হচ্ছে প্রত্যক্ষভিন্ন।

জৈনগ্রন্থ 'প্রমাণমীমাংসা'তেও অবিশদকে পরোক্ষ বলা হয়েছে-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

'অবিশদঃ পরোক্ষম্' ।- (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : অবিশদ-ই পরোক্ষ জ্ঞান।

তার মানে, বিশদ অর্থাৎ সম্যগভাবে বিষয়ের নির্ণয় প্রমাণের লক্ষণ হলে, অবিশদ অথচ সম্যগভাবে বিষয়ের নির্ণয় হলো পরোক্ষের লক্ষণ। আর এই পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান। তাই বলা হয়েছে-

'বিজ্ঞানং স্বপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জিতম্ ।

প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াৎ।।'

অর্থাৎ : বিজ্ঞান নিজেকে ও অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে। তা যখন সমস্ত বাধারহিতভাবে উৎপন্ন হয় তখন তা নিশ্চিত জ্ঞান। এই নিশ্চিত জ্ঞানকেই প্রমাণ বলে। এবং প্রমেয় বিষয় যে প্রকারে জ্ঞানে প্রকাশিত হয় সে অনুসারে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলা হয়।

জৈনমতে পরোক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার- মতি জ্ঞান ও শ্রুত জ্ঞান।

(১) মতি জ্ঞান : ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তায় বিষয়ের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে মতি জ্ঞান বলে। বাহ্যপ্রত্যক্ষ, আন্তরপ্রত্যক্ষ, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি জ্ঞান হলো মতিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়-মনের সংযোগ ভিন্ন মতি জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের আবরণের ক্ষয় বা উপশম হলে ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তায় তাদের সাথে সংযুক্ত পদার্থের যে যথার্থ জ্ঞান বা মনন তা হচ্ছে মতি। অতএব মতি হচ্ছে মননাত্মক জ্ঞান।

তবে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগভিন্ন যে জ্ঞান হয় তাকে মতি বলে না। তা হলো জ্ঞানের আবরণ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক তিন প্রকার- মনোগত, ইন্দ্রিয়গত ও বিষয়গত।
মাৎসর্য প্রভৃতি মনোগত প্রতিবন্ধক। কামনা, বাতিক প্রভৃতি রোগ ইন্দ্রিয়গত। বস্তুর সূক্ষ্মত্ব,

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অন্ধকার প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকা হচ্ছে বিষয়গত প্রতিবন্ধক। আবরণের সর্বথা বা পূর্ণ নাশ হচ্ছে ক্ষয়। বিদ্যমান আবরণের অনুদ্ভূত অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণক্ষয়ের নাম উপশম।

মতি জ্ঞান আবার দুই প্রকার- ইন্দ্রিয়জন্য ও অনিন্দ্রিয়জন্য।

বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জন্য এবং মানস জ্ঞানকে অনিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা হয়।

জৈনমতে মতি জ্ঞানের চারটি স্তর স্বীকার করা হয়েছে। যেমন- অবগ্রহ, ঈহা, অবায় ও ধারণা। এগুলিকে জৈনমতে জ্ঞান উৎপত্তির প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে।

জ্ঞানের প্রক্রিয়া :

সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈন দার্শনিকগণ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে জৈনদার্শনিক হেমচন্দ্র সূরি তাঁর 'প্রমাণমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন-

'ইন্দ্রিয়মনোনিমিত্তোহবগ্রহেবায়ধারণাত্ম সাংব্যবহারিকম্'।- (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : অবগ্রহ-ঈহা-অবায়-ধারণা এই প্রক্রিয়া-ক্রমে ইন্দ্রিয় ও মনের নিমিত্ত-বিষয়ের সাংব্যবহারিক জ্ঞানের অর্থাৎ মতিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

এখানে 'আত্ম' শব্দের দ্বারা ক্রমোৎপদ্যমান অবগ্রহাদির পরস্পর অত্যন্তভেদ নিরাস করা হয়েছে। তাই এই ধারাক্রমে পূর্ববর্তী স্তরগুলি উত্তরোত্তর-রূপে পরিণত হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে একটি প্রক্রিয়াই বলা হয়। এ যেন একই প্রক্রিয়ার চারটি স্তর। এই চারটি স্তর হলো- অবগ্রহ, ঈহা, অবায় এবং ধারণা। জৈনদার্শনিক হেমচন্দ্র অবগ্রহাদি চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করে চতুঃসূত্রী রচনা করেছেন।

অবগ্রহ : বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের দরুন উৎপন্ন জ্ঞানের প্রথম স্তর হচ্ছে 'অবগ্রহ'।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

উমাস্বাতি বলেছেন, অবগ্রহ হলো অনির্ণীত প্রত্যক্ষকরণ। এই অনির্ণীত প্রত্যক্ষকরণ দ্রব্য ভিন্ন গুণের জ্ঞান দিতে পারে না। একে সমুগ্ধ, আলোচন, গ্রহণ ও অবধারণ বলা হয়। অবগ্রহ হলো প্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী অবস্থা। এই অবস্থা উদ্ভাসিত হয় কোন বস্তু দর্শনের ফলে। অবগ্রহের লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র বলেছেন–

'অক্ষার্থযোগেদর্শন অনন্তরম্ অর্থগ্রহণম্ অবগ্রহঃ'।– (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : বিষয়ের সঙ্গে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগের অনন্তর বিষয়ের বিদ্যমানতার যে নিরাকার জ্ঞান হয় তাই অবগ্রহ।

মনুষ্যত্বাদি সামান্যধর্মবিশিষ্ট বস্তুর যে গ্রহণ অর্থাৎ মনুষ্যত্বরূপে সাধারণভাবে মানুষের যে জ্ঞান হয় তাকে অবগ্রহ বলে। জৈনদার্শনিকগণ অবগ্রহকে আবার দুটি স্তরে ভাগ করেছেন– বিজ্ঞানাবগ্রহ ও অর্থাবগ্রহ। বিজ্ঞানাবগ্রহ হচ্ছে কেবল জ্ঞেয়ের সাথে জ্ঞাতার সম্বন্ধ, আর অর্থাবগ্রহে জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানা ছাড়াও অনুভব করে।

ঈহা : অর্থাবগ্রহের পরবর্তী ও মতি জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে 'ঈহা'। তা হলো বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। এই দ্বিতীয় স্তরে আত্মা দৃষ্ট বস্তুর গুণের বা ধর্মের মূল্যায়ন করতে পারে। যেমন কোন শব্দ বা গোলমাল শুনলে কেউ প্রথমে কিসের শব্দ তা বুঝতে পারে না। 'এই শব্দটি কি শঙ্খের না শৃঙ্গের' এরকম সংশয় হলে মাধুর্য প্রভৃতি শাঙ্খ ধর্ম উপলব্ধ হলে এবং কার্কশ্যাদি উপলব্ধ না হলে এরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ পর্যালোচনার মাধ্যমে মতির যে চেষ্টা তা-ই ঈহা। এই স্তরে মানুষ সংবেদনের বিশেষ জ্ঞান এবং অন্য বস্তুর সঙ্গে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য জানার জন্য উৎসুক হয়। এই স্তরকে প্রকাশ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র বলেছেন–

'অবগৃহীত বিশেষাকাক্সক্ষণম্ ঈহা'।– (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : অবগ্রহ পরবর্তী বিশেষ আকাক্সক্ষার নাম ঈহা।

মনুষ্যত্বাদিরূপে মানুষের সাধারণ জ্ঞান হলে ঐ মানুষের বিশেষ জ্ঞানের জন্য আমাদের মনে আকাক্সক্ষা জেগে ওঠে। কোন শব্দ শ্রবণের অনন্তরই তাকে সঠিকভাবে জানার জন্য

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

আমাদের মধ্যে 'এই শব্দ কিসের শব্দ?'- এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। প্রত্যক্ষের এরূপ স্তরকে বলে 'ঈহা'।

এই স্তরে জ্ঞাতা শব্দের উৎস জানতে পারে, কিন্তু মতির প্রথম স্তর অবগ্রহে তা থাকে না। এই সংশয়পূর্ণ দ্বিতীয় মতিস্তরের জ্ঞানে বিষয়ের সম্যক নির্ণয় না থাকায় তাকে প্রমাণ বলা যায় না। কিন্তু অনির্ণয়াত্মক বলে অপ্রমাণও বলা যাবে না, কেননা তাতে নিজ বিষয়ের নির্ণয় হয়।

অবায় : এই স্তরে মানুষ অতীতের সঙ্গে বর্তমানে অনুভূত সংবেদনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করে বস্তুর সবিশেষ জ্ঞান লাভ করে। অবায়ের লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র বলেছেন–

'ঈহিতাবশেষনির্ণয়ো অবায়ঃ'।– (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : এই স্তরে ঈহিত বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান হয়, তাই অবায়।

কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে 'ঈহা' স্তরে যে সংশয় দেখা দেয়, এই স্তরে সেই সংশয় দূরীভূত হয়। 'অব' উপসর্গের অর্থ দৃঢ়, নিশ্চিত এবং 'অয়' শব্দের অর্থ জানা। মতির যে স্তরে জ্ঞাতা বিষয়টিকে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে তাকে অবায় বলে। ঈহিত বিষয়ের নির্ণয় হয় এই স্তরে। ঈহাকে স্বীকার করে কোন বস্তুতে 'এটি শঙ্খের শব্দ, শৃঙ্গের নয়' এরূপ বিশেষের যে নিরূপণ হয় তা হচ্ছে অবায়। এই স্তরে উদাহৃত শব্দের উৎসস্থানকে নিশ্চিত করতে পারে। কোন শব্দ শুনে আমরা যখন বলি যে, এই শব্দটি কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, তখন এই স্তরটিকে বলা হয় অবায়।

ধারণা : এটি হলো মতির অন্তিম স্তর। এই স্তরে জ্ঞাতার অন্তঃকরণে বিষয়ের একটি সামগ্রিক জ্ঞান হতে সংস্কার বা স্মৃতির উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্মৃতির হেতু হচ্ছে ধারণা। ধারণার লক্ষণ দিতে গিয়ে আচার্য হেমচন্দ্র বলেছেন–

'স্মৃতিহেতুর্ধারণা'।– (প্রমাণমীমাংসা)

অর্থাৎ : স্মৃতির হেতুই ধারণা।

হেমচন্দ্র ধারণাকে 'সংস্কাররূপ' বলে বর্ণনা করেছেন। ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা থেকে এই ব্যাখ্যা ভিন্ন। নৈয়ায়িকরা সংস্কারকে ধারণা বলে স্বীকার করেন না। জৈনমতে ধারণা হলো জ্ঞানের স্থিতিশীল স্তর। এই স্তরে জ্ঞান স্মৃতিহেতুরূপে মনে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও অনুমান পুরোপুরি এই স্তরে অন্তর্গত থাকে।

(২) শ্রুতজ্ঞান : অপরের কথা শুনে বা গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের যে জ্ঞান হয় জৈন দার্শনিকগণ তাকে শ্রুতজ্ঞান বলেছেন। অর্থাৎ, যা শব্দ-জ্ঞান হতে উৎপন্ন হয় তাকে শ্রুতজ্ঞান বলে। জ্ঞানের আবরণক্ষয় উপশমিত হলে মতিজনিত যে স্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে শ্রুতজ্ঞান। মতিজ্ঞান শ্রুতজ্ঞানের পূর্ববর্তী। মতিজ্ঞানে বস্তুর যে প্রকৃতি অনুভূত হয়, শ্রুতজ্ঞানে বস্তুর সেই প্রকৃতি-ই ভিন্ন উপায়ে জ্ঞাত হয়ে থাকে। নৈয়ায়িকমতে একে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়েছে। জৈনমতে এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হলেও স্বয়ং প্রত্যক্ষ বলে অতীন্দ্রিয়, তা আর ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেকারণে এই জ্ঞানকে শ্রুত বলা হয়েছে।

জৈনরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাই তাঁরা জৈনশাস্ত্র ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞানকেই 'শ্রুতজ্ঞান' বলেছেন। সায়ন মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের জৈনপ্রস্থানে শ্রুতজ্ঞানকে মতিজ্ঞানের তুলনায় উচ্চতর বলে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের আবরণের আরও ক্ষয় ও উপশম হলে মতিজনিত যে সুস্পষ্টজ্ঞান তাই শ্রুত। মতিজ্ঞান যথার্থজ্ঞান হলেও তা প্রাথমিক; শ্রুতজ্ঞানে জ্ঞান আরও স্পষ্ট হয়।

মতি জ্ঞান ও শ্রুত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হলো, মতি জ্ঞানের স্থিতি কেবল বিদ্যমান পদার্থে হয়, পরেরটি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রৈকালিক বিষয়ে হয়ে থাকে। শ্রুত জ্ঞান দুই প্রকার- অঙ্গবাহ্য ও অঙ্গপ্রবিষ্ঠ। প্রথমটিতে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টিতে এ ছাড়া অন্য শ্রুত জ্ঞান অন্তর্গত হয়েছে।